দৈনিক
ইত্তেফাক

25 JAN 2017

পাঠ্যবইয়ে ভুল ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়

নাহিদ ইমরান শাওন

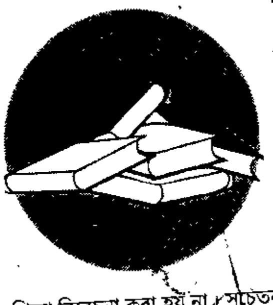

গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে এবার ভালোভাবেই যোগ হলো পাঠ্যবইয়ের ভুল। নতুন বছর এলেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা বাড়ে, মন্ত্রণালয়ের বাড়ে দায়সারার চাপ আর কোচিং-ব্যবসায়ীরা ফাঁদ পাতেন শিক্ষার্থী ধরার।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। সেখানে শিক্ষার মান এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে অভিভাবকেরাও সন্তুষ্ট নয়। মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও মাদরাসাশিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষা বিবেচনা করা হয় না। সচেতন অভিভাবকরা তাই কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজি মাধ্যমগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত পাঠ্যবই পড়তে দেওয়া হয়। সেখানেও শিশুর মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য বাধা এবং তা তুলে ধরে পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্যবার। শহর অঞ্চলে ইংরেজি মাধ্যমগুলোতে একটা বড় অঙ্কের টাকা ডোনেশন দিয়ে সন্তানকে ভর্তি করতে হয়। এই দুই মাধ্যমে শিক্ষাকে একটি বড় ধরনের লাভজনক ব্যবসায় বিবেচনা করা হচ্ছে। আর অভিভাবকেরা অযাচিতভাবে বিনিয়োগ করে যাচ্ছেন। নেই কোনো কর্তৃপক্ষ বা নজরদারি মহল।

কোচিং-বাণিজ্য নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু তার জন্য আজ পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অভিভাবকরাও নিশ্চয় কোচিং সেন্টারগুলোর পক্ষে নন। কারণ সেখানে টিউশান ফিসের পরিমাণ নেহাত কম নয়। কিন্তু বিদ্যালয়গুলোর পাঠদানের মান অভিভাবকদের বাধ্য করে সন্তানদের কোচিঙে পাঠাতে। স্কুলের শিক্ষকরাও কোচিং পেশার সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই জড়িত। প্রতিটি স্কুলের কমপক্ষে চারজন শিক্ষক (শহর অঞ্চলে আরো বেশি) কোচিং ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত এবং নিয়মিত ক্লাসে তাদের পাঠদান যথেষ্ট অসন্তোষজনক। তাহলে কোচিং সেন্টার বন্ধের জন্য প্রথম পদক্ষেপটা সরকারের হাতে এবং তার সঙ্গে শিক্ষকদের মূল্যবোধ বজায় থাকার প্রশ্ন।

আজকাল কোচিংই যেন মূলধারার বিদ্যালয় আর বিদ্যালয়গুলো কেবল শিক্ষার্থীর পরিচয় বহনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। বিদ্যালয়ে চার থেকে সাত ঘণ্টার পাঠ্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের দৌড়াতে হয় কোচিং সেন্টারগুলোতে।

প্রাথমিক শিক্ষার বৈচিত্র্য থাকার উদাহরণ উন্নত দেশে আছে কিন্তু তাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথেষ্ট নজরদারি থাকে এবং সব মাধ্যমকেই মূলধারার মাধ্যম বিবেচনা করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা উচিত এবং জাতিগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য তার বিকল্পও দেখি না।

উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করার পর একজন শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয় তখন আসলে সেই শিক্ষার্থী বুঝতে পারে, এতদিন তার কিছুই পড়া হয়নি। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যিমিকে ভালো ফল করার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পায় না। কেন? আসলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আমাদের কেবল শেখানো হয়, কিছু জানানো হয় না। কীভাবে লিখতে হয়, কীভাবে পড়তে হয়—এইটাকে শিক্ষা মনে করা হয়। অথচ শেখার পরেও কত কিছু জানার আছে বা জানতে জানতে শেখার বিষয় এবং ধারণাগুলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম ধাপ হিসেবে আবার কোচিং সেন্টারগুলোকে বেছে নেয়।

তাহলে প্রশ্ন হলো—বিদ্যালয় বা কলেজগুলোতে কি কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় না? শিক্ষার মান নিয়ে এত কথা। এই মান অর্জনের জন্য আসলে করণীয় কী? শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, না শিক্ষকের যোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ? পাঠ্যবই কি শিক্ষালাভের একমাত্র উপায় নাকি দলগত কাজ বা খেলার মাঠও গুরুত্বপূর্ণ? প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অজানা নয়। কেবল কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তা বাস্তবায়ন দরকার।

বাংলাদেশের যে সম্ভাবনার কথা বলা হয় তা বাস্তবায়ন করার জন্য আগামী দিনে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক দরকার হবে। নতুবা এই ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠী জাতির জন্য কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা ও শিক্ষাকে জীবিকায় পরিণত করার জন্য এখনই সরকারের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়া নিঃসন্দেহে ভালো দিক। কিন্তু আদর্শ জাতি গঠনে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের আরো বেশি সচেষ্ট থাকতে হবে।

পরিশেষে, শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ—শিক্ষকতাকে কেবল একটা পেশা হিসেবে না দেখে জাতি গড়ার মহৎ দায়িত্ব হিসেবে দেখুন। আপনাদের একটু আন্তরিকতা আগামীর বাংলাদেশকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়